**নদীর অস্তিত্ব ও আমাদের সভ্যতা**

**মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন**

 পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। নদীমাতৃক এ দেশে নদীর অস্তিত্বের সাথে জীবন যাত্রা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য দেশটিকে যেমনভাবে বিশ্ব মানচিত্রে বিশেষভাবে পরিচিত করেছে তেমনি এ দেশের অধিবাসীদের আর্থসামাজিক,সাংস্কৃতিক,ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে চলেছে।বাংলাদেশে হিমালয় থেকে উৎপন্ন জলের ধারা প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে।পথিমধ্যে বাংলা নামের এ জনপদকে সমৃদ্ধ করেছে অসংখ্য নদনদী দিয়ে। নদীমাতৃক বাংলাদেশ কালের আবর্তে দখল দুষন উজান থেকে আসা পলির কারনে নদীমাতৃক পরিচয়টা হারিয়ে যাচ্ছ।এই নদীর সাথেই বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা,সুখ-দুঃখ,আবেগ-ভালোবাসা জড়িত রয়েছে।নদী পথ আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। মিশরের নীল নদ যেমন মিসরের প্রাণ,তেমনি পদ্মা,মেঘনা,যমুনা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ।প্রতিটি নগরের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য সেই নগরের সব কিছুর ভিত্তি তৈরি করে। ঢাকার এই মৌলিক ভিত্তি রচনা করেছে তার নদীগুলো বুড়িগঙ্গা,তুরাগ,বালু প্রভৃতি।

 সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানুষের জীবনযাত্রার সাথে নদীর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে,মনীষীদের লেখায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে নদনদীর স্তুতি। সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে নদীর ভূমিকার দিকটি বিবেচনা করে ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট সান্ড্রা পাস্টোল বলেছেন- মানবসভ্যতার ইতিহাস পানির (নদী ও সাগর) অবদান ছাড়া আলোচনা করা অসম্ভব। বস্তুত নদীর অবদানেই প্রাণ পেয়েছে মানবসভ্যতা।এই নদীকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে রচিত হয়েছে কালজয়ী গান। রচিত হয়েছে নদী ও নদীপারের মানুষের জীবন সংগ্রাম নিয়ে ‘পদ্মানদীর মাঝির’মতো কালজয়ী উপন্যাস। বলা হয় তেরশত নদীর দেশ বাংলাদেশ। হাজারও নদী জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে পুরো দেশ জুড়ে। পদ্মা,মেঘনা,যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র এগুলোর মধ্যে প্রধান। এছাড়াও তিস্তা,সুরমা,কুশিয়ারা,বুড়িগঙ্গা,শীতলক্ষ্যা,মধুমতি,করতোয়া,কর্ণফুলী,গড়াইসহ অসংখ্য ছোট বড় নদী আছে এ দেশে।প্রতিটি নদীরই রয়েছে স্বাতন্ত্র।বাংলার জনপদগুলোকে গভীর মমতায় জড়িয়ে রেখেছে এসব নদী ।

 সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই নদীকে কেন্দ্র করেই মানুষ তার বসতি স্থাপন থেকে শুরু করে জীবনযাত্রা নির্বাহের পথ খুঁজে পেয়েছিল। নদীর তীরে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল আফ্রিকার হাড্ডার অঞ্চলের মানবজাতি। আদি অনন্ত কাল থেকেই নদী ব্যবসা বাণিজ্যের,জনবসতি স্থাপনের,কৃষিকাজ,শিল্প ক্ষেত্রে ও যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাচীনকাল থেকেই নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল বড় বড় সভ্যতা যেমন নীল নদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু নদকে কেন্দ্র করে সিন্ধু সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীকে ঘিরে সুমেরীয় সভ্যতা এবং চীনের হোয়াংহো ও ইয়াং সিকিয়াংকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে চৈনিক সভ্যতা। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে নদীর সাথে মানুষের এক আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই নদী ও মানবজাতির সম্পর্কে কিছুটা ছেদ পড়েছে। যে নদীকে কেন্দ্র করে মানবজাতি একদিন উন্নয়নে শিখরে পৌঁছনোর যাত্রা শুরু করেছিল এবং মানব সভ্যতার উন্নতিতে নদীর ভূমিকা অপরিসীম, সেই নদীকে আজ মানুষ ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছে নানা ভাবে। আমাদের অসচেতনতা এবং উদাসীনতার কারণে অনেক নদ-নদী আজ সংকটের মুখে, কোনো কোনো নদী আবার হারিয়ে গেছে, কেউ কেউ নিজের গতি পরিবর্তিত করে বয়ে চলে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। নদী ও মানবজাতি একে অন্যের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে।

 নদী উপত্যকা সভ্যতা হল একটি কৃষিপ্রধান জাতি বা সভ্যতা যা নদী থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। একটি "সভ্যতা"বলতে নগর উন্নয়ন,সামাজিক স্তরবিন্যাস,শ্রমের বিশেষীকরণ কেন্দ্রীভূত সংগঠন এবং যোগাযোগের লিখিত বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিক উপায় সমন্বিত বৃহৎ স্থায়ী বসতি সহ একটি সমাজকে বোঝায়। একটি নদী বাসিন্দাদের পানীয় এবং কৃষির জন্য জলের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস দেয়। প্রথম মহান সভ্যতা,যেমন মেসোপটেমিয়া এবং প্রাচীন মিশরে,সবাই নদী উপত্যকায় বেড়ে উঠেছে। মেসোপটেমিয়ার উরুকের সময়কাল প্রায় ৪০০০ থেকে ৩১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে এবং এটি নিকট প্রাচ্যে রাজ্যগুলির অস্তিত্বের প্রথম চিহ্ন প্রদান করে । মিশরের নীল উপত্যকাটি ৫৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের প্রথম দিকে কৃষি বসতিগুলির আবাসস্থল ছিল,কিন্তু একটি সভ্যতা হিসাবে প্রাচীন মিশরের বৃদ্ধি ৩১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি শুরু হয়েছিল। তৃতীয় সভ্যতা সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কিছু অংশে যা বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তান (ব্রোঞ্জ যুগের ভারত দেখুন)) চতুর্থ মহান নদী সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীনের হলুদ নদীর তীরে। নদী মানেই তো জল,আর জল মানেই তো প্রাণ।নদীর সঙ্গে ছুটে চলেছে মানুষ। গড়ে তুলেছে জনপদ। বনচারী মানুষ খুঁজে পেয়েছে তার ঠিকানা। যেখানে জলের উৎস সেখানে জীবন ধারণ সহজ সাধ‍্য।চাষবাষ,পশু পালন সবেতেই চাই জল। ঘুম থেকে উঠেই চাই জল,ঘুমতে যাওয়ার পূর্বেও চাই জল । কোন সভ‍্যতা কি মরুভূমিতে গড়ে উঠেছে কখনো। আর্য সভ‍্যতা গড়ে উঠেছিল সিন্ধু নদের কিনারে।চাষবাষ পশু পালন ছিল আর্যদের প্রধান উপজীবিকা।এইসব কাজের জন‍্যে তারা সিন্ধুর জল ব‍্যবহার করত ।বর্তমানেও দেখা যায় পাহাড়,বন বা মরুভূমি অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী জনবহুল স্থান হল গঙ্গার তীরবর্তী স্থান।এই নদীর তীরেই অবস্থিত বিখ‍্যাত কেদারনাথ,বদ্রীনাথ,হরিদ্বার,হৃষিকেশ,আগ্রা কানপুর,এলাহাবাদ পাটনা ও কোলকাতা শহর।অধিক সুবিধার্থে এই নদীর কিনারে গড়ে উঠেছে বহু কলকারখানা ভারতের ব্রহ্মপুত্র,নর্মদা,কৃষ্ণা,কাবেরি ও যমুনা জনবহুল স্থান হিসেবে পরিচিত।কৃষি সভ্যতা নদীকে সামনে নিয়ে এগিয়ে চললেও শিল্পবিপ্লব নদীকে আর সামনে রাখতে পারেনি। দিন দিন তা পিছিয়ে নিয়ে গেছে। নগর সভ্যতায় নদী ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। আবর্জনা,মলমূত্র,কলকারখানার বর্জ্য সবকিছুর স্থান হয়েছে নদীতে। নদীর চরিত্র হারানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষও তার চরিত্রের পরিবর্তন দেখতে পায়।

 প্রতি বছর দেশের নদীগুলোর ওপর দিয়ে ১ দশমিক ২ বিলিয়ন টন পলি বহন করে নিয়ে যায়। এ পলি নদীর তলদেশ ভরাট করে ফেলে।১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত লেদারল্যান্ডসের নদী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় নদী জরিপ করে নেডেকো’রিপোর্ট তৈরি করা হয়।১৯৭৫ সালে বি.আই.ডব্লিউ.টি.এর জরিপ থেকে দেশে ২৪ হাজার কি:মি: নৌ পথের তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৪৬ সাল থেকে বিভিন্ন নৌপথের নাব্য কমতে শুরু করে।১৯৭৭ সালে ২১৬ মাইল নৌপথ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালে আরো ২১ কিঃ মিঃ নৌপথ বন্ধ হয়। দেশে বর্তমানে সকল নৌপথের মধ্যে ১২ থেকে ১৩ ফুট গভীরতা সম্পন্ন প্রথম শ্রেণির নৌপথ রয়েছে মাত্র ৬৮৩ কিলোমিটার। ৭-৮ ফুট গভীরতার দ্বিতীয় শ্রেণির নৌপথ রয়েছে এক হাজার কিলোমিটার। ৫-৭ ফুট গভীরতার তৃতীয় শ্রেণির নৌপথ রয়েছে ১ হাজার ৮৮৫ কিলোমিটার। ৪১ বছরে নৌ-পথ কমেছে সাড়ে ২১ হাজার ৫শ কিলোমিটার।নদী যদি তার স্বাভাবিক গতিপথ হারায় তবে তার বিরূপ প্রভাব আমাদের ওপর পড়বে নিঃসন্দেহে। তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় নদীপথগুলো টিকিয়ে রাখা জরুরি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দেশের নদী দখলকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে থেকে দখল মুক্ত করতে হবে। এ কাজে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন দিবে। প্রকৃতির আশীর্বাদপুষ্ট নদীমাতৃক বাংলাদেশের উপর দিয়ে ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীসহ (৫৪টি ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ এবং ৩টি মায়ানমার হতে বাংলাদেশে প্রবেশ) সর্বমোট ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। বাংলাদেশে পানির প্রাপ্যতার ধরণ হলো বর্ষাকালে পানির অতি আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রচন্ড ঘাটতি। উজান থেকে নেমে আসা পানির প্রবাহ যেমন দেশের নদ-নদী সমূহের কূল উপচিয়ে বন্যা সৃষ্টি করে, তীব্র স্রোত নদী ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি পানির প্রবাহের সাথে নেমে আসা দেড় কোটি টন বিপুল পরিমাণ পলি নদ-নদী ও অন্যান্য জলাধারসমূহের অভ্যন্তরে জমা হয়ে নদ-নদী/ জলাধারের পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস,পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পরিবেশ, নৌ-চলাচল, কৃষি, মৎস্য ও জলজ প্রানী সম্পদের উন্নয়ন দেশের বিদ্যমান পানি সম্পদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও এর টেকসই উন্নয়ন সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে।

 ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় প্রায় ৪৪৩৯ কিঃমিঃ নদী,খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন করা হচ্ছে। ফলে ১০০টি ছোট নদী,৩৯৬টি খাল ও ১৫টি জলাশয় পুনরুজ্জীবিত হবে। জলাশয়,খাল ও নদীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপিত হবে। জলাভূমি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে। শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহারের জন্য পানি ধরে রাখা সম্ভব হবে,নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং বন্যার প্রকোপ হ্রাস পাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আনুমানিক ৫,২০,০০০ হেক্টর এলাকায় জলাবদ্ধতা,বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় হতে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।প্রায় ১,৩০,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের ফলে বার্ষিক প্রায় ৩,৫০,০০০ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ের আওতায় ২১২টি ছোট নদী,২০০৪টি খাল ও ৯৯টি জলাশয় পুনঃখনন করা হবে যার মোট দৈর্ঘ্য ১৩৮৪৩.২৯ কিঃমিঃ। দেশের প্রধান প্রধান নদীসমূহে ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় পুনঃখননসহ ৩১০১ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং সমাপ্ত হয়েছে এবং ৫০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন কার্যক্রম চলতি অর্থ-বছরের কর্ম-পরিকল্পনায় রয়েছে।ড্রেজিং কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন সাইজের ৩৫টি ড্রেজার (আনুষাঙ্গিক জলযানসহ) এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ২০২০-২১ অর্থ-বছরে ১৫১১ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন,১৮৫ কিঃমিঃ সেচ খাল পুনঃখনন,৯০ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ,১১৭১ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ,৯২ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। বিগত ১৪ বছরে নদীতীর সংরক্ষণধর্মী ১০৮টি,সেচধর্মী ৩৪টি,বন্যা নিয়ন্ত্রণ/নিষ্কাশনধর্মী ৪৯টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।দেশের প্রায় ১১০ লক্ষ হেক্টর বন্যামুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৯১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে (সেচধর্মী ১৩৭টি প্রকল্প) প্রায় ৬৫.১২ লক্ষ হেক্টর জমিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ,সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এতে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ১১১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে যা দেশের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

 শরীরের রক্তধারার মতোই যেন বাংলাদেশের নদী এদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সুজলা-সুফলা,শস্য-শ্যামলা করে তুলেছে এদেশকে। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে অনেক নদী হারিয়েছে তার যৌবন।নদী না বাঁচলে যে বাংলাদেশ বাঁচবে না তাতে কোনো সন্দেহ নেই।নদী আমাদের যতটা সুযোগ দিয়েছে মানুষ তার দ্বিগুণ হারে অপব্যবহার করছে। মানুষের উদাসীনতা ও অসচেতনতা প্রধান কারণ। যদি ভবিষ্যতে সুস্থ পরিবেশ উপহার দিতে হয় তবে সচেতন হওয়া দরকার। অনেক নদী সংস্কারের মাধ্যমে বাঁচিয়ে তোলা দরকার ভীষণভাবে। তাই মানবজাতির উচিৎ সকলে একত্রিত হয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া যে আর নদীর অপব্যবহার নয়,এবারে সুস্থ করে তুলব নদীগুলোকে। এজন্য বাংলার প্রকৃতি,অর্থনীতি ও সংস্কৃতির স্বার্থেই নদীগুলোকে রক্ষা করতে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।

#

**লেখক:** সিনিয়র তথ্য অফিসার জনসংযোগ কর্মকর্তা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার